ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৪র্থ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪২২

মহাপ্রস্থানের পথে: প্রবোধকুমার সান্যালের ভ্রমণ-উপন্যাস

পুরনজিত মহালদার*

সারসংক্ষেপ: গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকে যখন 'কল্লোল' (১৯২৩) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে পালাবদলের সূচনা হয় তখন প্রবোধকুমার সান্যালের (১৯০৫-১৯৮৩) কথাসাহিত্যিকরূপে আত্মপ্রকাশ। বোহেমিয়ান এই কথাকার তাঁর সমকালেই ভ্রমণ-সাহিত্য রচনায় বিশিষ্ট মর্যাদার আসনে আসীন হন। প্রবোধকুমার সান্যালের বেশিরভাগ রচনা ব্যক্তির পথ চলার কাহিনী নিয়ে রচিত। *মহাপ্রস্থানের পথে* (১৯৩৩) তার মধ্যে অন্যতম। আলোচ্য প্রবন্ধে পথ চলার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের সমাজ-জীবনের বহুকৌণিক বাস্তবতাকে এই ভ্রমণ-উপন্যাসে ঔপন্যাসিক কীভাবে ধারণ করেছেন তা দেখার পাশাপাশি শৈল্পিক প্রযত্নের বিষয়টিও বিশ্লেষণের প্রয়াস চালানো হয়েছে।

মহাপ্রস্থানের পথে প্রবোধকুমার সান্যালের তীর্থযাত্রার আত্ম-অভিজ্ঞতামূলক উপন্যাস। অভিজ্ঞতার সূত্র ধরে স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে এই উপন্যাসের বিস্তৃত পটভূমি। নেপথ্যবিধান বা Flash back রীতিতে অর্থাৎ স্মৃতিলোকে পেছনে ফিরে গড়ে নেওয়া হয়েছে উপন্যাসটিকে। গঠনগত বৈশিষ্ট্যে পিকারেস্ক উপন্যাস অনুযায়ী হওয়ায় *মহাপ্রস্থানের পথের* কোনো বদ্ধ প্লট নেই, নেই কোনো জমাটবদ্ধ কাহিনী। এলোমেলো ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করেছে উপন্যাসের কথক অর্থাৎ নায়ক। উত্তম পুরুষের কথনে বর্ণিত হয়েছে কথকের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা। বেশকিছু পথচলতি চরিত্রের মনোজাগতিক চেতনা আর মুগ্ধতায় আবিষ্ট করা প্রকৃতিবর্ণনা নিয়ে গঠিত এই উপন্যাসের শরীর। এক বিস্তৃত-ব্যাপক ভৌগোলিক পরিসীমায় পুণ্য-লাভের প্রত্যাশায় অবারিত ছুটে চলা মানব-মানবীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে *মহাপ্রস্থানের পথের* শিল্পিত রূপাবয়ব।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে প্রবোধকুমারের নিকট এক আত্মীয়ের মৃত্যুতে তাঁর মনটা বড়ই বিষণ্ন হয়ে ওঠে এবং সেই সূত্রেই তিনি হঠাৎ কেদারবদ্রী দর্শনে বের হয়ে পড়েন।[১] এই ভ্রমণে অসংখ্য তীর্থযাত্রীর মতো রাণীর সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে সখ্য। ভ্রমণ শেষে রানী জিজ্ঞাসা করে, "ভ্রমণকাহিনী কি আপনি লিখবেন? কোন কাগজে?...যদি লিখি 'ভারতবর্ষেই' লিখব।"[২] হিমালয় দর্শন থেকে ফিরে কাশীতে বসে একদিন সুধাংশুদাকে বেলা দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত একটানা সাতঘণ্টা ধরে বলেন হিমালয় যাত্রার গল্প।[৩] সুধাংশুবাবু ভ্রমণের গল্প শুনে প্রবোধকুমারকে বলেন, 'তুমি ঠিক যেভাবে আমাকে আগাগোড়া বললে ঠিক একইভাবে সবটা লিখে ফেলতে পারবে?'[৪] তাঁর কাছে লেখার এই অনুপ্রেরণা পেয়ে প্রবোধকুমার শুরু করেন লেখা। কলকাতায় বসে তিন কিস্তি এবং নেপালে গিয়ে দুই কিস্তি লেখেন এবং রচনাটি মোট পাঁচ কিস্তিতে *মহাপ্রস্থানের পথে* শিরোনামায় *ভারতবর্ষ* মাসিক পত্রিকায় মাঘ ১৩৩৯ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

প্রকাশিত হয়।[৫] এছাড়া লেখক নিজেই *মহাপ্রস্থানের পথে* রচনা সম্পর্কে বলেন, '১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে আমি কেদারবদ্রী তীর্থযাত্রা করি এবং চারশো মাইলের কিছু বেশী আমাকে পায়ে হেঁটে পরিক্রমা শেষ করতে হয়,— সেই পরিক্রমা ঋষিকেশ থেকে আরম্ভ এবং আলমোড়া জেলার রাণীক্ষেত নামক পার্বত্য শহরে তার শেষ। মোট আটত্রিশ দিনে এই যাত্রা শেষ হয়। এই কাহিনীটি নিয়েই লেখা হয়েছিল *মহাপ্রস্থানের পথে*।'[৬]

*মহাপ্রস্থানের পথে*র 'উত্তর ভাষণে' তরুণ প্রবোধকুমার সান্যালের আত্মস্বীকৃত চঞ্চল চিত্তলোকের 'আত্মবিস্মৃত অস্থিরতার' পরিচয় উৎকীর্ণ হয়ে আছে। পরমার্থ লাভের প্রচণ্ড প্রত্যাশায় দ্বন্দ্ব-সংক্ষুব্ধ চেতনার বহুকৌণিক ভাবধারা প্রবহমান এই উপন্যাসে। অন্তর্লোকের অফুরন্ত তাগিদে অপার্থিব সত্য-সুন্দরের অমেয় আকর্ষণে পরিব্রাজক দৃষ্টি ছুটে গেছে দূরান্তের পথে। অন্তহীন রহস্যের সন্ধানে কথকের দ্বান্দ্বিক মত ও পথের সংশ্লিষ্ট হয়ে 'যন্ত্রণাজর্জর তীর্থযাত্রীর আত্মহারা ভক্তিবিহ্বলতা'র পাশাপাশি মাটির পৃথিবীর বাস্তবনিষ্ঠ জীবন-জীবিকার কলরবও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে এই উপন্যাসে। অজস্র বিপত্তি, হতাশা, আত্মগ্লানি আর মৃত্যুর অবর্ণনীয় ভীতি-কোনকিছুই দমিয়ে রাখতে পারেনি পুণ্যলাভের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাকে। অসংখ্য তীর্থস্থান, প্রকৃতির নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী, আর পৌরাণিক ইতিহাসের অসামান্য মিশেলে *মহাপ্রস্থানের পথে* হয়ে উঠেছে শাশ্বত শিল্পের অখণ্ড আধার। সূচনায় *মহাপ্রস্থানের পথে* খুব বেশি তরঙ্গায়িত নয়। একপ্রকার কাব্য ভণিতার আদলেই পাঠকের সামনে কথক বা লেখকের উপস্থিতি। সাদামাটা ভঙ্গিতে কাহিনীতে প্রবেশ। কোন চমক ছাড়াই দীর্ঘ তীর্থপথে পাঠককে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এরপর একে একে অসংখ্য চরিত্রের আনাগোনা এবং তা বিভিন্ন কার্যকারণসূত্রে। অগ্নিদাহের প্রথম বৈশাখে 'দূরের ব্যাকুল বাঁশী'র মন্ত্রমুগ্ধ আহ্বানে নগরজীবন জটিলতার বৃত্ত থেকে সঙ্গিহীন অন্তরাত্মা বেরিয়ে পড়ে হিমালয়ের পথে। নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনের হিসেব-নিকেশ, গণ্ডীবদ্ধ জীবনের সংকীর্ণতার বাইরে পরমার্থের যে অমোঘ আহ্বান, তারই আকর্ষণে কাশী হয়ে হরিদ্বারের দিকে প্রথম যাত্রা এই উপন্যাসে। স্থান ও কালের ক্রমাণুবর্তিতায় গৃহবিবাগী, চাঞ্চল্যহীন, নির্বিবাদ ও নির্লিপ্ত তীর্থযাত্রীর অভিজ্ঞতা ও আত্মোপলব্ধির স্বরূপ বিশ্লেষিত হয়েছে চরিত্রানুগ প্রেক্ষাপটে। 'উপক্রমণিকায়' প্রবোধকুমার সান্যাল তৈরি করেছেন কাহিনী বলার পটভূমি। কাদের নিয়ে কাহিনী আবর্তিত হবে, কী বলা হতে পারে, কীভাবে বলা হতে পারে তার সম্ভাব্যতা নিরূপিত হয়েছে এখানে। মূলত কথকই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র। তার দৃষ্টিকোণেই উপন্যাসকাহিনী শুরু। একদিকে প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে তার সম্পৃক্ততা, অন্যদিকে নিজের সাথে নিজের বোঝাপড়া। তীর্থযাত্রী হিসেবে প্রথমত কথক ও অন্যান্য চরিত্রের কাহিনীতে প্রবেশ ঘটলেও ধীরে ধীরে নানা ঘটনার আবর্তে জড়িয়ে পড়েছে সবাই। ফলে সরলরৈখিক গতির পরিবর্তে কাহিনীর চড়াই-উৎরাই লক্ষণীয়। ভগবত গীতায় বিশ্বাসী চেতনায় 'সংসার মায়া, কর্মত্যাগেই মুক্তি, ভগবানের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও পরিপূর্ণ আত্মদান ছাড়া মানুষের গতি নেই, তুচ্ছ জীবন, মোক্ষলাভই পরম লক্ষ্য'র[৭] নিষ্কাম ভাবনা যেমন বর্ণিত হয়েছে তেমনি 'মনোরম নিভৃতি যোগাশ্রমের মধ্যেও মানুষের ছোটোখাটো কলহ-

সংশয় ও বিদ্বেষ মাঝে মাঝে সংযম ও তপস্যার আবরণ সরিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায়'[৮] – একথাও বাদ পড়েনি *মহাপ্রস্থানের পথে*'র মহাক্ষেত্রে। লেখক সচেতন মানসে স্মরণ করেছেন যে তিনি ভ্রমণকাহিনী বয়ন করেছেন, এবং এই সচেতনতার মধ্য দিয়েই নির্মিত হয়েছে উপন্যাসতুল্য শিল্পরূপ এবং '*মহাপ্রস্থানের পথে* প্রকাশিত হতেই প্রবোধকুমার বাংলা সাহিত্যের সাধকদের মধ্যে প্রথম সারিতে এসে আসন গ্রহণ করলেন। সামনে রইলেন রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র।'[৯]

মহাপ্রস্থানের পথে'র শিল্পভাবনা ভিন্ন ধাঁচের। প্রবোধকুমার সান্যালের ঔপন্যাসিক সত্তার মৌল চিন্তার স্মারক *প্রিয় বান্ধবী*র (১৯২৯) মাত্র তিন বছর পরে প্রকাশিত হয় এই উপন্যাস। এই উপন্যাস লেখার আগে প্রবোধকুমার সান্যালের উপন্যাসের চিত্র-চারিত্র্য একটি সুনির্দিষ্ট গঠন পেয়ে যায়। ফলে চিনতে পারা যায় তাঁর চলার বেশকিছু ভঙ্গি। জানা যায় তাঁর বিবৃতির ধরন। এতদিনে তাঁর উপন্যাসশিল্পকে বেঁধে আনার একটা সহজ-সরল ভাব মিলে যায়, পাওয়া যায় একটি সরলরৈখিক পথ তাঁর উপন্যাসের গতি-প্রকৃতি নির্ণয়ে। *প্রিয় বান্ধবী*তে জীবনের স্বরূপ সন্ধানী চিত্তের যে স্বাতন্ত্র্য সূচনা, *মহাপ্রস্থানের পথে*তে তা পরিপূর্ণ। রচনারীতিতেও অনেক বেশি কৌশলী এবং অন্তর্ভাবনায় গভীর তাৎপর্যমুখী।

মূলত 'উপক্রমণিকায়' যাত্রা শুরু হলেও 'যাত্রার' মধ্য দিয়ে কাহিনীর আনুষ্ঠানিক চলন বর্ণিত। পথের অধীন হয়ে পথের অমোঘ নির্দেশেই তীর্থযাত্রীর অবিরত পথচলায় একে একে সম্মুখবর্তী হয় সমস্যা ও সংকটের নানা চিত্র। দিন-তারিখের উল্লেখে 'পদব্রজ' যাত্রার কাঙ্ক্ষিত তীর্থস্থান বদ্রীনারায়ণ। কিন্তু চলার শুরুতেই আত্মদ্বন্দ্বে জর্জরিত কথক মন। সমাজ-সংসারের বাইরে এসে কথকের মনে হয়েছে: 'আজ আমার সন্ন্যাসীর বেশ, কিন্তু সে যে শুধু পরিচ্ছদ, শুধু বহিরাবরণ, দেশের কথা মনে হলেই যে এখনো দেহের লক্ষ লক্ষ স্নায়ু ঝন ঝন করে বেজে ওঠে।'[১০] তার অন্তরে বেজে ওঠে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি। দক্ষিণী, সিন্ধি, পাঞ্জাবি, হিন্দি, মারোয়াড়ি, উড়িষ্যা, গুজরাটি, মারহাট্টির সাথে কথকের বাঙালি যাত্রীদল মিশে যায় একাকারে। সবার মধ্যে নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব। আবার যাত্রীর সাথে আছে সরল, ভদ্র, বিশ্বাসী কুলি। অর্থের প্রতি তাদের 'মোহ আছে কিন্তু তার জন্য দুষ্প্রবৃত্তি নেই। তারা বিবাদ করবে কিন্তু প্রবঞ্চনা করবে না। তারা দরিদ্র বটে, কিন্তু দারিদ্র তাদের হৃদয়কে কলুষিত করেনি, বিত্তহীন, কিন্তু চিত্তহীন নয়।'[১১] উত্তরাখণ্ডের গঙ্গার তীরে তীরে এগিয়ে চলে পথ। গঙ্গা, অলকানন্দ, মন্দাকিনীর পাড়ে পাড়ে গাড়োয়ালবাসীর জীবন-জীবিকা, সমাজব্যবস্থা এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতের কুলি-কামিনীর নিরন্তর পরিশ্রমী জীবনের অলঙ্কৃত চিত্রল উপস্থাপনার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে কাহিনীর ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্রাতি প্লট।

কাহিনীর অগ্রগতির সূত্র ধরিয়ে দিতে লেখক কখনো মাইলের হিসেব, কখনো দিনের হিসেব স্মরণ করেছেন। *মহাপ্রস্থানের পথে*তে ধারণ করা কালসীমা খুবই কম। 'যাত্রা' পর্বের ছাব্বিশ দিন এবং 'পুনরাগমনের' প্রায় দশদিন এই উপন্যাসের ব্যাপ্তিকাল। সময়ের হিসেবে লেখকের এই কৌশলের কারণেই পাঠক কাহিনীর অজস্র তীর্থ, নদ-নদীর ভীড়ে খেই

হারিয়ে ফেলে না। কখনো চড়াই, কখনো উৎরাই পথে পদব্রজে চতুর্থদিন প্রাতে ব্যাসঘাটের উদ্দেশ্যে যাত্রা। দুর্গম, দুরারোহ, প্রস্তরসঙ্কুল বত্রিশ মাইল পথ হেঁটে নয়ার নদীর পুল পার হয়ে ব্যাসগঙ্গার চটিতে আশ্রয় গ্রহণ। ইতোমধ্যে পার হয়ে আসা নাইমুহানা, বিজনী, শোমালু, কান্দি, বান্দর চটিতে বিশ্রামের সুযোগ কাজে লাগিয়েছেন লেখক। উপন্যাসে অধিকাংশ চরিত্রের আবির্ভাব বিভিন্ন চটি অর্থাৎ বিশ্রাম-কেন্দ্রেই। শুধু তাই নয়, চরিত্রের সমূহ স্বরূপ উপস্থাপনায় লেখকও ব্যয় করেছেন বিস্তর ভাষা। বান্দর চটিতে বিশ্রামরত মধ্যভারতের বুরহানপুর জেলার সন্ন্যাসী যোগীর বেশধারী তীর্থযাত্রী পণ্ডিতজীর চারিত্র্য উদঘাটনে লেখকের দীর্ঘ বয়ান: 'লোকটির বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পয়ষট্টির মধ্যে। রোগা ও দীর্ঘদেহ, কয়েকটা দাঁত নেই, চাতুর্য ও ভগবদ্‌ভক্তির সংমিশ্রিত দীপ্তিতে দুটো চোখ উজ্জ্বল, গলায় ছড়া চার-পাঁচ রুদ্রাক্ষের মালা, জপে বসে থলিটি খুলে ফোঁটা-চন্দন-তিলক সেবা করেন, মুখে বোল ছিল সীতারা'।[১২] লেখকের এই বিস্তৃত বিবৃতিতে পণ্ডিতজী চরিত্র যেন ভেসে ওঠে পাঠকের চোখের সামনে। সেই সাথে আবার যখন ভাষা দিয়েছেন চরিত্রের মুখে তখন তারা হয়ে উঠেছে বিশ্বাস্য জীবন্ত চরিত্র। চারুর মা যখন বলে ওঠে, 'শুনচ, অ বা'ঠাউর, ভাদুর ... যেদিন ছেলে হ'লো, কী বিষ্টি, তেমনি অন্ধকার, আমি বলি, আর বুঝি বিউতে পারে না'[১৩] তখন চারুর মায়ের চরিত্র যেন সব খোলস ছেড়েই বেরিয়ে আসে সামনে। আবার বামন বুড়ির সংলাপেও পাওয়া যায় তার অন্তর্গত চেতনার পূর্ণ স্বরূপ: 'থাম্ থাম্, আ সর, অবাধ্য মাগি,... ছুসনি আমাকে, ঐখানে সরে বোস, ইত্যিজাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে আমার জাতধর্ম আর কিছু রইল না। দেশে গিয়ে প্রাচিত্তির না করলে আর...'।[১৪] বামন বুড়ি চরিত্র উদঘাটনে তার সংলাপই যথেষ্ট হয়েছে। সূচনার পটভূমি চিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে বোঝা যায় লেখক কোন রঙে, কী রসে, কেমন জীবন ধারণ করতে চেয়েছেন এই গ্রন্থের বিস্তৃত ক্যানভাসপটে। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় একটির পর একটি তীর্থ, চটি বা বিশ্রামাগার, ক্ষুরধার নদী-শাখানদীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। পথের বাস্তবতা আর ব্যস্ততার মাঝে অসংখ্য চরিত্রের আবির্ভাব দৃশ্য প্রতীকী কার্যকারণ সম্পৃক্ত। স্থানিক পটভূমি, ঘটনা ও চরিত্রের নানাবিধ সমস্যার সংহত সমন্বয়ে কাহিনী যখন একটু একটু করে ওপরের দিকে অগ্রসর লেখক তখন আত্মদর্শন প্রচারে অতিমাত্রায় সরব। ফলে একটি সম্ভাব্য শীর্ষবিন্দুতে কাহিনীর উত্থান হয়ে উঠেছে বিলম্বিত। ব্রহ্মচারীর রহস্যঘেরা জীবন পরিক্রমা অনুধাবন শেষে লেখকের বক্তব্য:

> পৃথিবীতে যে মানুষ সকলের চেয়ে সুখী বলে আমাদের ধারণা, তার যখন মৃত্যু ঘটে তখন আমরা সবাই তার আত্মার শান্তি-কামনা করি। মানুষ আসলে যে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে দুঃখ পায়, এখানে যে তার শান্তি নেই, একথা মানুষ আপন অন্তরেই অনুভব করে। করে বলেই দেব দেবতার সৃষ্টি, স্বর্গের সৃষ্টি, পরলোকের সান্ত্বনার সৃষ্টি, শিল্প, সাহিত্য, কৃষ্টি, সভ্যতা, সমস্ত ছাড়িয়েও মানুষের দৃষ্টি উর্ধ্বদিকে। গভীরের মধ্যে সে খুঁজেছে একটি পরম সান্ত্বনার বাণী। আশার আশ্রয় জীবনের চরম পরিণামের মধ্যে একটি সুদূর বেদনাকে সে নিরন্তর অনুভব করে।[১৫]

প্রবোধকুমার সান্যালের বেশ কিছু উপন্যাস ব্যক্তির পথ চলার কাহিনী নিয়ে রচিত। *মহাপ্রস্থানের পথে* তার মধ্যে অন্যতম। এই পথ দীর্ঘ ও বিস্তৃত। এক একটি পথধারা যেন জীবন-মৃত্যুর সমতুল্য। চরিত্রের চলিষ্ণুতাকে আশ্রয় করেই ছড়িয়ে পড়েছে উপন্যাসের কাহিনী। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'ইহার দৃশ্য পরিবর্তনের ফাঁকে ফাঁকে ইহার চলিষ্ণুতার গতিছন্দে ঔপন্যাসিক রস খানিকটা জমাট বাঁধিয়াছে। গ্রন্থটিতে লেখকের দার্শনিক অনাসক্তি, উদার মননশীলতা, বৈরাগ্যস্পৃষ্ট শিথিল জীবনানুসন্ধিৎসা পরিস্ফুট।'[১৬] সেই সাথে অঙ্কিত চরিত্রের অর্জিত বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতায় সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের একটা পূর্ণাঙ্গ অবয়ব বা চিত্রল রূপ ধারিত হয়েছে। কথকের ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব-সংকট, তার অন্তরের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার সামগ্রিক বোধ দ্বারা *মহাপ্রস্থানের পথের* প্লট নিয়ন্ত্রিত। কথক এমন একজন প্রতীকী মানব যার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের সমগ্র সমাজজীবনের একটি সমুন্নত গতি রূপ পেয়েছে।

দেবপ্রয়াগের বিশ্রামরত সময় শেষে পুনরায় বন্ধুর পথ। পরম প্রত্যাশার বদ্রীনারায়ণের স্পর্শ পেতে তীর্থযাত্রীর নিরন্তর অগ্রগতি ঠিক জীবনতীর্থের মতো। অসংখ্য চিত্রকল্পের প্রয়োগে কাহিনী এগিয়ে যায় সময় ও পথের ক্রমানুসারে। 'শুক্লাপঞ্চমীর জ্যোৎস্না কলাগাছের চওড়া পাতাগুলির' ওপর যেমন 'রূপোর পাতের মতো ঝলমল' করে তেমনি কথকের হৃদয়পটেও শুদ্ধ শিল্পরচনার 'গভীর অনুভূতির নির্মল আনন্দ' খেলা করে। অন্তরের ভাবাবেগ আর শারীরিক ক্লান্তি, পীড়ন, অপারগতার সমারোহ পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। খিদিরপুরের মাসি, মনসাতলার নির্মলা আর সত্তর বছর বয়স্কা চারুর মায়ের কাতোরোক্তি ও অনাহারী মুখায়বের মাঝে অঘোরবাবুর অল্পবয়স্কা স্ত্রী রাধারাণীর স্নিগ্ধ হাসি এবং হিতকামনার প্রশান্তি-প্রবাহ চলেছে হাত ধরাধরি করে। কিন্তু কথকের ভাষ্যে যখন জানা যায় যে, মাত্র ছয়দিনের হাঁটা শেষে তখনও প্রায় একমাসের পথ বাকী তখন প্লটে যুক্ত হয় সমস্যার নতুন মাত্রা। কিন্তু পরক্ষণেই লেখক অপরূপ সৌন্দর্যলীলার তীর্থভূমিতে পাঠককে টেনে নিয়েছেন। তবে এই প্রকৃতি, তীর্থ-তীর্থপথ মানবাতীত নয়। প্রবোধকুমার সান্যাল মানুষকে উপেক্ষা করে তা করতেও চাননি। প্রকৃতিসংশ্লিষ্ট বর্ণনার পরই আছে বিভিন্ন শ্রেণি-বিশেষের সরল-সাদামাটা জীবনচর্যার ছবি। সমস্যা ও সংকটের নানা চিত্র। সেই সাথে বিভিন্ন সুরে জীবনকে হরেক রকম রূপে ও রসে উপস্থাপনের শৈল্পিক দায়বদ্ধতা।

স্পৃশ্যতা-অস্পৃশ্যতা ও জাতিবিচারের সকল ভেদরেখার বাইরে পণ্ডিতজী, পাগড়িপরা রামায়ার, পুণা আগতা মারহাট্টি বৃদ্ধা, গোপালদা, অমরা সিং, কুলি কালিচরণ ও তুলসি রাম, ব্রহ্মচারী, অঘোরবাবুর স্ত্রী ও শ্বাশুড়ী, রুইদাস সুক্কুল সবাই যেন আত্মার আত্মীয়। একই পরিবারের পরিব্রাজক। তীর্থযাত্রার পথ তাদের জীবনেরই নামান্তর। উপন্যাসে তাই সংসার বিবাগী উদাসী ভবঘুরে শ্রান্ত রিক্তহৃদয়ধারী তীর্থযাত্রীর মানসলোকে লেখক প্রবেশ করেছেন অবলীলায়। এরপর একে একে বের করে এনেছেন তাদের অন্তর্গত রহস্যকথা। শ্রীনগরের প্লটে পাওয়া যায় এমনই দিক। ভীলগঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থল ভীলকেদার বা ঢুণ্ডুপ্রয়াগ

পার হয়ে শ্রীনগরের ঘটনায় লেখক একই সঙ্গে তীর্থযাত্রীদের ওপর তীর্থগুরুদের জুলুম-চাতুরী এবং ভারতবর্ষব্যাপী সমসাময়িক আইন অমান্য আন্দোলনের খণ্ডচিত্র তুলে ধরেছেন। তবে মাঝে মধ্যে স্বদেশী আন্দোলন ও ভারতবর্ষের সমকালীন রাজনীতির হাল্কা ও হঠাৎ উপস্থাপনা কাহিনীতে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক ও প্রস্তুতিহীন বলে অনুমিত হয়। রাষ্ট্রীয় সমস্যার সূক্ষ্ম অন্তর্চিত্রণের চেয়ে ভট্টিসেরায় এসে লেখকের দৃষ্টিতে আরও বড় হয়ে দেখা দিয়েছে সনাতনী চতুর্বর্ণ প্রথার জাতিবিচার ও অস্পৃশ্যতার প্রাসঙ্গিক রূপ। বিংশ শতাব্দীতেও টিকে থাকা এই রূপ ভারতবর্ষের অন্য এক বাস্তবতা। হিন্দু-ধর্মের চতুর্বর্ণ বিভাজন প্রথা যে তখনও ভারতীয় জীবনের গভীরে শেকড় গেঁথে ছিল তা এই পর্বে স্পষ্ট। আধুনিকতার দোহাই দিয়ে মানুষ ছাই-চাপা দিতে চায় বর্ণপ্রথার অগ্নিস্ফূলিঙ্গ, কিন্তু কোথায় যেন থেকে যায় বিরাট ফাঁক। অঘোরবাবু ও বামন মার কলহপূর্ণ সংলাপে উঠে এসেছে বর্ণপ্রথার ভয়ঙ্কর চিত্র: 'কি পাপেই তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে মা, শুকনো কাপড়খানি আমার কোন আক্কেলে ছুঁয়ে দিলে? শূদ্দুরের বাড়াবাড়ি আজকাল বড্ড বেড়ে গেছে বাছা।'[১৭] মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন, তাঁর কারাবরণ, সন্ত্রাসবাদী ধারার বিস্তার, ইংরেজের রূঢ় শাসন-শোষণের মাত্রা নির্ণয়ে লেখকের ব্যবহৃত দুই একটি দৃশ্য বা সংলাপ কিংবা সনাতনী বর্ণপ্রথার অলঙ্ঘনীয় রূপাঙ্কণ প্রবোধকুমার সান্যালের যৌবনের উচ্ছ্বসিত রোম্যান্টিক ভাবাগেরই ফল। ছাত্তিখালের উত্তুঙ্গ ও মর্মান্তিক দুই মাইল চড়াই অতিক্রম করে খাঙ্করা চটি হয়ে অলকানন্দার পুল পার হয়ে রুদ্রপ্রয়াগের প্লট সমস্যার অতি উচ্চে আরোহণ করেছে। এখানে কথক ও অন্যান্য যাত্রীর অসহনীয় পায়ের ব্যথা, জ্বালা-যন্ত্রণা, দুঃসহ ক্লান্তি, ছিন্ন-মলিন পোষাক, ধূলিস্নাত কালিবর্ণ দেহ, 'কোটর প্রবিষ্ট ক্ষীণ ও শূন্য দৃষ্টি, রক্তহীন শীর্ণ রূপ' আর সমাজস্থিত মানুষের স্থূল বাস্তবতা, দৈন্য ও আত্মস্বার্থের অতি মাত্রার ঘাত-প্রতিঘাতে কথকের কণ্ঠে বেজে উঠেছে দ্বান্দ্বিক সুর: 'সব চুলোয় যাক, সমস্ত ধ্বংস হোক, এর কী প্রয়োজন ছিল কেউ আজ বলতে পারে? কী আমরা চাই? এই দুঃখের অবসান যেদিন হবে, কী আমাদের মিলবে সেদিন? কাঙ্গালের মতো দৈন্য ও মালিন্য নিয়ে কী ভিক্ষে করতে এসেচি?'[১৮] আত্মদ্বন্দ্বে জর্জরিত কথক-মনে তীর্থযাত্রীদের মনে হয়েছে 'পুণ্যলোভী তীর্থকীট'। এরপর কথকের সামনে উপস্থিত হয় নাটকীয় চমক। দীর্ঘপথচলার সহযাত্রী অঘোরবাবুর স্ত্রী রাধারাণীর লালিত্যময় যত্নে-স্নেহে-দাক্ষিণ্যে ও ব্যবহারে দিনে দিনে তাঁর প্রতি যে শ্রদ্ধা ও সম্মান সৃষ্টি হয় তা এক মুহূর্তে ভেঙে পড়েছে খান খান হয়ে রাধারাণীর প্রকৃত পরিচয় উন্মোচিত হওয়ায়। রাধারাণীর সহজ স্বীকারোক্তিমূলক বর্ণনায় লেখক: 'মেয়ে ও মা মাথা হেট করলেন এবং তেমনি নতমস্তকেই অঘোরবাবুর স্ত্রী সজলকণ্ঠে বললেন, আমি তোমার বড় বোন, কিন্তু আমার মানসম্ভ্রম নেই, জাতধর্মও নেই। আমি... আমি বেশ্যা।'[১৯] এই ঘটনার পর অস্থির মানসিকতার মধ্যে অন্ধকার রাতে মন্দাকিনী ও চন্দ্রার সঙ্গমস্থলে পথ হারানো কথকের সামনে হঠাৎ 'কপালকুণ্ডলার' আবির্ভাবে ঘটে যায় অপার্থিব বিষয়ের আরও একটি নাটকীয় চমক।

রুদ্রপ্রয়াগ থেকে অলকানন্দকে বিদায় দিয়ে মন্দাকিনীর পাড় ধরে কেদারনাথের পথ 'ভীষণ চড়াই, প্রাণঘাতী বিপদসঙ্কুল, পথে দুমূর্ল্য খাদ্যবস্তু, তুষারের ঝটিকা, প্রকৃতির ভয়াবহ রূপ'।[২০] এর মাঝেই লেখক স্মরণ করে দেন প্রায় একশ কুড়ি মাইল পথ অতিক্রম করার হিসেব। আর পথচলার মাত্রিকতায় তাদের পথ যে মহাপ্রস্থানেরই তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। পথচলার এই বহুমাত্রিকতায় পৌরাণিক কাহিনীর আদলে গড়ে ওঠা তীর্থক্ষেত্র সম্পর্কে লেখকের যুক্তিসঙ্গত উপস্থাপনা: 'সমগ্র মহাভারত ও রামায়ণ গ্রন্থ দু'খানি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছে। ভারতবর্ষের সভ্যতা ও শিল্পকলা, ধর্ম ও আচার, শাস্ত্র ও দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞান এই দু'খানি মহাকাব্যকে কেন্দ্র করে যে গড়ে উঠেছে তাতে আর সন্দেহ নেই।'[২১] ভ্রমণ উপন্যাস হিসেবে তাই *মহাপ্রস্থানের পথের* পরতে পরতে ভারতবর্ষের সভ্যতা সংস্কৃতি, ইতিহাসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অলঙ্কৃত বর্ণনার বিস্তার লক্ষণীয়। দৃষ্টির সামনে দিয়ে প্রবাহিত ও ঘটতে থাকা চলমানতার ভাষিক উপস্থাপনায় ঔপন্যাসিকের নৈর্ব্যক্তিকতা, ক্যামেরাম্যানের দৃষ্টিতে ধরা পড়া অসংখ্য চিত্রগ্রাহ্য চিত্রের উদ্ভাসন এবং জার্নালিস্টধর্মী বিবৃতি প্রদানের মধ্য দিয়েই নিরূপিত হয়ে যায় *মহাপ্রস্থানের পথের* সফলতা-ব্যর্থতা। দুর্গম পথের অসহনীয় পীড়ন সহ্য করে দুর্লভ পুণ্য লাভের স্বপ্নে বিভোর অসংখ্য তীর্থযাত্রীর মধ্যে কথকের আত্মদ্বন্দ্ব হয়ে ওঠে প্রবল। কেদারনাথের মন্দিরে এসে পরম নির্বাণ লাভ সম্পর্কিত প্রসঙ্গে কথকের যে দোলাচল মনোবৃত্তি তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সমস্ত উপন্যাসের শরীরে। এখানে তার বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয়। মন্দিরের ভেতর দাঁড়িয়ে তার অস্ফুট আত্মজিজ্ঞাসা হয়েছে অন্তর প্রতিধ্বনিত। কথকের বর্ণনায়:

> কী বলবো, কী প্রার্থনা জানবো? এই নির্বোধ প্রস্তর-স্তূপের সমুখে দাঁড়িয়ে কাঙ্গালপনা প্রকাশ করবো- সে যে ভয়ানক ছেলেমানুষী। অথচ একজন পথশ্রান্ত সামান্য তীর্থযাত্রী, সেইটুকুই ত আমার শেষ পরিচয় নয়। আমি যে ক্ষুদ্র, আমি যে নগণ্য এই কথাই বা অনুভব করি কোন সকীর্ণতায়? আবেগ দিয়ে, আনন্দ দিয়ে, বিশ্বাস ও প্রেম দিয়ে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা এই যে মাটি আর পাথর, এর পাশে দাঁড়িয়ে নিজেকে যদি ছোট করে ভাবতে না পারি সে কি নিতান্তই অহমিকা? দেবতার কাছে এসে দাঁড়ালেই যে আমি আপন দেবত্বকে অনুভব করি?[২২]

উপর্যুক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে অনুমিত হয় যে, পরমাত্মার সন্ধান আর অধ্যাত্মভাবনা যদি জীবনকে চরম অবস্থায় দূরে ঠেলে দেয় তবে সে সন্ধানী চেতনা প্রবোধকুমার সান্যালকে আকৃষ্ট করে না। যদি জীবনকে ভালবাসা যায় অন্তর দিয়ে তবে পরলোকের পরম পাওয়ার প্রত্যাশা মানুষকে মাটি বিচ্ছিন্ন করতে পারে না, শুধু পুণ্য লাভের প্রচেষ্টায় যদি অধ্যাত্মবোধ সবকিছুকে গ্রাস করে তবে আত্মবোধের আলোকপ্রাপ্তি অসম্ভব। উপন্যাসের প্রারম্ভ থেকে শুরু করে আস্তিকতা-নাস্তিকতার এই দ্বন্দ্ব বা দোলাচল মনোপ্রবৃত্তির প্রবাহ বজায় থেকেছে উপন্যাসের সমাপ্তি অবধি। বস্তুত মহাজীবনের বৃহৎপরিসরে লেখক এবং অন্যান্য চরিত্রের আত্মোপলব্ধি এবং জীবনার্থের পরম তাৎপর্যের শিল্পিত রূপাঙ্কনই *মহাপ্রস্থানের পথের* অভীষ্ট প্রতিপাদ্য।

উপন্যাসে কথকের চৈতন্য যেমন বারবার রঙ বদলিয়েছে তেমনি প্লট গঠনও হয়েছে বৈচিত্র্যধর্মী। কেদারনাথ প্রসঙ্গ শেষ করা হয়েছে অতি দ্রুত। লেখক ইচ্ছা করেই কেদারনাথের পর্দা নামিয়ে 'নতুন উৎসাহে' ধরেছেন বদ্রীকাশ্রমের পথ এবং জানিয়ে দিয়েছেন আঠার দিন পথ হাঁটার হিসেব। বদ্রীকাশ্রমের পথ ধরতেই কথকের হৃদয়ে জাগ্রত হয়েছে জীবনের রহস্যময় গতিতত্ত্ব আর আত্মা-পরমাত্মার মিলনস্বরূপ: 'আমরা যেন চিরদিবসের তীর্থযাত্রী, চির-তীর্থপথিক। জন্মজন্মান্তর পার হয়ে চলেছি চির-সুন্দরের পদপ্রান্তে; যেমন চলেছিলেন একদিন শ্রীমতী শতবর্ষ বিরহ পার হয়ে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে আত্মাঞ্জলি দিতে। প্রেমের তপস্যাই এই, বেদনার মধ্যে তার রূপ, অন্তরে তার দুঃখলোক। যে চিরদুর্লভ, যার জন্য এই দুর্গম পথযাত্রা, এই পীড়ন, যার জন্য এই যন্ত্রণাজর্জর পথের প্রাণান্তকর তপস্যা সেই রূপাতীত রূপকে আমার চাই, সে আমার আশার পরিতৃপ্তি, সকল পাওয়ার শেষ পাওয়া।'[২৩] কথকের এই আত্মগত অনুভব-উপলব্ধি সর্বজনীন আবেদনে সমুন্নত থেকেছে। জীবনের পাওয়া না পাওয়া, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ, কৌতূহল ও আকাঙ্ক্ষার বিচিত্র রূপ এবং স্নেহ-মমতা, প্রতারণা-পীড়ন, দৈন্য-অপমান কোনকিছুর মধ্যেই ব্যাহত হয় না, থেমে থাকে না পরিপূর্ণ আত্মজাগরণ আর আত্মোদ্ধারের অসীম উৎসাহে সামনের পথে এগিয়ে চলা। লেখকের ভাবনায় সামনের এই পথটাই মৃত্যুর পথ। সমস্ত আয়োজন, সব উপকরণ বিসর্জিত হয় 'মৃত্যুর পদতলে।' তাই বৈশাখী পূর্ণিমার শুক্লা চতুর্দশীর দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বে আপাত অবিশ্বাসী কথক মনে উঁকি দেয় নিয়তির অমোঘ পরিণতির সূত্র:'সবকিছুরই নিয়ন্তা নিয়তি, নিয়তির কাছে আমরা আত্মসমর্পণ করেচি, আমাদের জীবন ও মরণ তারি কাছে বাঁধা। আমরা নিয়তির কাছে সাজানো পুতুল, তার ইচ্ছার ইঙ্গিতে নড়ে চড়ে বেড়াই, হাসি আর কাঁদি, বাঁচি আর মরি। আমাদের সকল কাজকর্মের পিছনে সে আছে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে, তার অঙ্গুলি-নির্দেশ মেনে নিতে হবে। আমাদের স্বতন্ত্র সত্তা কিছু নেই।'[২৪] সমগ্র উপন্যাসে একদিকে প্রকৃতির বসন্ত, বর্ষা, শীত ও গ্রীষ্মের যেমন ছড়াছড়ি তেমনি রাউন্ড চরিত্র হিসেবে কথকের পরিবর্তনশীলতাও লক্ষণীয়। পাশাপাশি প্লট গঠনও এই রূপান্তর প্রক্রিয়া চোখ এড়াতে পারে না। *মহাপ্রস্থানের পথের* গঠনরীতি, ঘটনাবিন্যাস, প্লট পরিকল্পনা, কাহিনী ও চরিত্রের সমন্বয় সবসময় পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয় না। তার মুখ্য কারণ উপন্যাসের শিল্প কৌশলকে লেখক এখানে বড় করে দেখেননি। উপন্যাসের অন্তর্নিহিত বোধ, সুগভীর উপলব্ধি এবং জীবনসংশ্লিষ্ট চিত্রকল্পই প্রাধান্য পেয়েছে। ফলে গাঠনিক ভিত্তি হয়েছে সাধারণ। তবে বাহ্যিক চিত্র পরিমিত না হলেও অন্তর্গত ব্যঞ্জনা সার্থকতার পথেই এগিয়েছে।

উখীমঠ ছেঁড়ে কাঁথা চটি এবং গোলিয়া বগড় পার হয়ে দোয়েড়া চটিতে বিশ্রাম, অতঃপর পৌথিবাসা, বানিয়াকুণ্ডু, ভুলোকোনা, তুঙ্গনাথ হয়ে পাঙ্গরবাসা, গোপেশ্বর এবং চামোলি থেকে গরুড়গঙ্গার চটিতে এসে লেখক জানিয়েছেন বাইশ দিনের যাত্রা সমাপ্তির কথা। এই পর্বের লক্ষণীয় বিষয় গন্তব্যে পৌছানোর দ্রুত বর্ণনা। সেই সাথে পথের বর্ণনায় না গিয়ে এখানে তিনি সমাজনীতি, স্বল্প রাজনৈতিক আবহ, বাউল ও বোহেমিয়ান জীবনের স্বরূপ,

জীবনসংশ্লিষ্ট সাহিত্য ও সাহিত্য স্রষ্টার সমূহ ভূমিকা বা দায়বদ্ধতার বিস্তৃত বিশ্লেষণে মনোযোগী। দীর্ঘ বিরতির পর চারুর মা, বামন বুড়ি, তুলসীরাম এবং গোপালদার স্বল্পস্থায়ী দেখাও মিলেছে এখানে। তবে মুখ্য হয়ে উঠেছে বদরীনাথে পা রাখার আকুলতা আর কাব্যময় ভাষার গতিশীলতা। সরাসরি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান ও কবিতার ব্যবহারও করেছেন লেখক। কথকের প্রতীক্ষিত অন্তরাত্মা ছুটে চলেছে তারই আশায়, 'যে তাঁর কণ্ঠে দেবে পরম বাণী, কানে আত্মপ্রকাশের মূলমন্ত্র, সৌন্দর্য সৃষ্টির উৎসমুখ দেবে খুলে, শক্তি ও সাহস-বিস্তৃত হৃদয়, অফুরন্ত প্রেম ও অকৃপণ দাক্ষিণ্য, চোখে দেবে অনির্বাণ স্বপ্নলোক, বুকে অনন্ত বহ্নিক্ষুধা'।[২৫] উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কথক অর্থাৎ প্রবোধকুমার সান্যাল নিজেই। যেসব উপন্যাসে তিনি ব্যক্তি অভিজ্ঞতার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন সেসব উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বা নায়কের সাথে তাঁর ব্যক্তিজীবনের অনেক সাজুয্য পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে পুরোপুরি নিজের বক্তব্য, ভ্রমণকাহিনীর মধ্য দিয়ে উপন্যাসের আদলে শুধুই প্রতিষ্ঠা করেছেন নিজের মতামত। এক জটিল মিশ্রণ পদ্ধতিতে লেখক কাহিনী গড়েছেন। কথক, ব্রহ্মচারী, গোপালদা এবং অঘোরবাবুরা এক একটা সমাজপ্রতীক। *মহাপ্রস্থানের পথে* একটি পথ চলার শিল্প মাধ্যম এবং এর ভেতরের স্বপ্নদর্শী মানব ও মানবেতর চরিত্রগুলো নিয়ে কাহিনী নির্মাণের খেলায় মেতেছেন প্রবোধকুমার সান্যাল। সেখানে জীবন ও শিল্প এবং জীবিকার এক আশ্চর্য মিশ্রণে উপন্যাসের গৃহ নির্মাণ করেছিলেন সেদিনের ছাব্বিশ-সাতাশের প্রবোধকুমার সান্যাল। আস্তিকতা-নাস্তিকতার দ্বন্দ্ব, পাওয়া না পাওয়ার টানাপোড়েন, আর পথ চলার পদে পদে অজস্র বিপত্তির সমারোহ লক্ষণীয় উপন্যাসবিধৃত চরিত্রের মাঝে। ফলে এই উপন্যাসে জীবন ও শিল্পের মাঝে কোন আড়াল নেই।

তেইশতম দিনে ঝড়কুলা ও সিংহদ্বার পার হয়ে যৌশমঠ থেকে শ্রী বিষ্ণুপ্রয়াগে পৌঁছে কথক জানিয়েছেন, এখান থেকে বদ্রীনাথ মাত্র 'ষোল-সতের মাইলের পথ'। হিমালয়ের শীর্ষে ওঠার মতো কাহিনীও এই পর্বে শীর্ষবিন্দুতে উপনীত হয়েছে। বিষ্ণু আরাধনায় নারদের সর্বজ্ঞ হবার বর-প্রাপ্তি, পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর স্বর্গারোহণ করার পথের পৌরাণিক ইতিবৃত্তের সমূহ বর্ণনা এখানে। অর্ধাহারে, উপবাসে গতিহীন দেহ শেষপথও শেষ করতে কুণ্ঠাবোধ করে। কিন্তু মনের মধ্যে নিয়ত বদ্রীনাথ কীর্তন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সঙ্কটাপন্ন পথ মাড়িয়ে লামবগড় ও হনুমান চটি রেখে এসে পঁচিশতম দিনে কাঙ্ক্ষিত 'মায়াময় বিচিত্র অমরাবতীর' স্পর্শে উদ্বেলিত কথকমন। তবে ঈপ্সিত সাফল্য অর্জনের পর চিরপরিব্রাজক হৃদয়ের যে চিরায়ত দ্বন্দ্ব তার প্রকাশ হয়েছে অনিবার্যভাবে: 'আমাদের সেদিনের সামান্য তীর্থযাত্রা আজ বিরাটের পদতল স্পর্শ করেছে। মন বললে তুমি এই? এই তোমার রূপ? যার জন্য এলাম সে'ত মন্দিরে নেই, সে যে আমার আছে পথে-পথেই। সামান্য মন্দিরে তুমি'ত বন্দী নও'।[২৬] আত্মজিজ্ঞাসায় ধ্বনিত হয়েছে 'নাস্তিকের আত্মগ্লানি' আর 'অবিশ্বাসবাদীর অবচেতন প্রতিক্রিয়া।' কিন্তু পরমুহূর্তেই ক্লাইমেক্সের তীব্র মোহনায় কথকের অন্তরে জাগ্রত হয়েছে সনাতন বিশ্বাস ফিরে পাওয়ার কোমল আকুতি: 'আমার এই তৃষাতুর হৃদয়েও আশ্রয় করেচে, তুমি একে মুক্তি দাও! অবিশ্বাস নয়, সন্দেহ নয়, দ্বন্দ্ব নয়, আমি সেই

আবহমানকালের হিন্দু, সেই চিরন্তন হিন্দুকুলে আমার জন্ম, আমার শিরার রক্তে হিন্দুর সেই আদিম শুচিতাবোধ তোমার চরণের তলায় আমিও যেন দলিত হই, ধন্য হই, কৃতার্থ হই।'[২৭] পথচলার কাহিনী পথিকের মনোপথে স্থির হওয়ায় নাট্যিক আবহ জোরালো হয়ে উঠেছে। একদিকে জগৎসংসারের পারিপার্শ্বিক চিত্রল রূপ অন্যদিকে অন্তর্লোকের দ্বান্দ্বিক আশা-নিরাশার বহুকৌণিক দৃষ্টি উপন্যাসের সমস্যাকে এই পর্বে করে তুলেছে পরিণতিমুখী। ফলে একঘেয়ে কাহিনীর প্রত্যাশিত পরিণতি উপন্যাসরীতির ক্ষেত্রে রেখেছে অনন্য অবদান।

প্রবোধকুমার স্যানালের পূর্বেও বাংলা উপন্যাসে ভ্রমণের অনুষঙ্গ লক্ষণীয়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের *রমাসুন্দরী* বা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *শ্রীকান্ত* উপন্যাসে নায়ক-নায়িকার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন ভূমিকা রেখেছে কিন্তু *মহাপ্রস্থানের পথেতে* কথক অর্থাৎ লেখক বা নায়কের ভ্রমণকেই ঔপন্যাসিক উপন্যাসের মূল উপাদানে রূপ দিয়েছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, 'ভারতের অন্য শ্রেষ্ঠ সাহিত্যস্রষ্টাদের মত হিমালয়ের মহিমার দ্বারা প্রবোধবাবুও আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং হিমালয়ের সঙ্গে তাঁহার আত্মিক যোগকে তিনি সাহিত্যে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। এইখানে তিনি ভারতের সাহিত্য–ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট ধারার পরিপোষণ করিয়াছেন।'[২৮] উপন্যাসের পূর্বাংশে ভ্রমণকাহিনীই মুখ্য যা দিনলিপির আঙ্গিকে বিবেচিত। অন্যদিকে পর্যটক কথক ও তীর্থযাত্রী রাণীর আত্মিক সংযোগ স্থাপনের কাহিনী সংযোজিত হয়েছে উত্তরাংশে। এই উত্তরপর্বটিই এই উপন্যাসের মুখ্য প্লট। মূলত বদ্রীনাথ যাত্রা পর্যন্ত কাহিনীর প্রস্তাবনা অর্থাৎ রাণীর সঙ্গে কথকের প্রথম সাক্ষাৎ অবধি। আর কর্ণপ্রয়াগে যখন পুনরায় দু'জন মুখোমুখি তখন থেকেই কাহিনীর প্রকৃত বীজবপন। ভটোলী চটির পর কাহিনীর ঊর্ধ্বগতি। মেহেলচৌরিতে এসে যখন রাণী বলে 'শাসন এবং সন্দেহ মাথা চাপড়াতে থাকুক, আমরা এগিয়ে যাই'-তখন কাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন বিন্দু দৃশ্যমান হয়। 'গগার্স' নাম্নী ক্ষুদ্র পাহাড়ী শহরে এসে কাহিনী শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে যায়। পরবর্তীতে কথক যখন বলে, 'একথা আর অস্বীকার করার উপায় নেই, আমাদের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট মমত্ববোধের সৃষ্টি হয়েছে, আসন্ন বিদায়ের আভাস আঘাত করছে তাকেই'— তখন থেকেই কাহিনীর নিম্নগতি শুরু হয়ে দ্রুত পরিণতির দিকে এগিয়েছে।

'পূর্ণযাত্রার' অন্তে এসে লেখক 'পুনরাগমনের' সূচনা করেছেন প্লটের কার্যকারণ বন্ধন দ্বারা। ঘটমান বর্তমানের আবহে নিষ্ঠুর 'ঔদাসীন্যে' যাত্রা শুরুর সাথী ব্রহ্মচারীর বিদায় দেখিয়েছেন নাটকীয় ভঙ্গিমায়। সেই সাথে নাট্যমঞ্চেও আবির্ভাব ঘটেছে 'পুণরাগমন' কাহিনীর মুখ্য চরিত্র রাণীর। 'যাত্রা' পর্বের সমস্যার শীর্ষবিন্দুতে এসে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটতে পারত, কিন্তু লেখকের শিল্পভাবনা আরও বিস্তৃত পথে এগিয়েছে। তারই সূত্রে কাহিনীতে টেনে এনেছেন হরিদ্বারে প্রথম আলাপ হওয়া জ্ঞানানন্দ, চৌধুরী মশাই, দিদিমা, পিসি ও গোপালদা চরিত্রকে। বিদায় দিয়েছেন অমরা সিংকে। যাত্রা-পর্বের শেষে এসে রাণীর সাথে কথকের হঠাৎ সাক্ষাৎ লাভ। প্রথম দেখার মধ্যে তেমন কোনো কৌতূহল নেই। স্বাভাবিক

সহজপ্রবণতার মধ্যেই পরিচয়। অথচ এই চরিত্রের দ্বারা যে কাহিনীর বাকি পথ এগিয়ে যাবে তেমন কোন সূত্র এখানে অনুপস্থিত। এরপর কাহিনীর একরৈখিক গতিতে ধীরে ধীরে রঙের মিশেল শুরু। রাণীর আগমনে প্লট জমাটবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পেল এবং কাহিনীর এই বাকবদল পাঠকের মধ্যে সঞ্চার করে আগ্রহের নতুন ঝিলিক। 'যাত্রা' পথের বিলম্বিত গতি 'পুনরাগমনে' পেয়েছে নতুন গতি, আরোহিত শক্তি। কথকের বর্ণনায়: 'দু'ঘণ্টায় এলাম হনুমান চটি, মধ্যাহ্নে এলাম পাণ্ডুকেশ্বর। সন্ধ্যার পরে পৌছালাম বিষ্ণুপ্রয়াগ ও যৌশীমঠ পার হয়ে একেবারে সিংহদ্বারে।'[২৯] 'পুনরাগমনের' প্রায় অর্ধেক পথ পেরিয়ে এসে পাওয়া গেল নাতনীর সম্যক পরিচয়, 'নাতনীর নাম রাণী। — মা বাপ নেই, স্বামীর হলো অকাল মৃত্যু। ছেলেটি করতো সরকারী চাকুরী। এখন মামার বাড়িতেই থাকে।'[৩০] পাঁচ দিনের পরিচয়সূত্রে রাণীর সাথে কথকের ঘনিষ্ঠতা এবং রোমান্টিক ভাবাবেগের মধ্যেই ঘটেছে তার ক্রমবিকাশ। নিরানন্দের পথে পাওয়া যায় সহজ-সরল গতি। অন্তরে বেজেছে 'পথের আনন্দ-বেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়' আর মহাকবির 'যুদ্ধ দীপ্ত সে মহাজীবনে চিত্ত ভরিয়া লব' পঙ্‌ক্তির অমৃত মন্ত্র। মূলত একটি সূক্ষ্ম রোমান্টিসিজমের চিত্র আঁকাই লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই সম্পূর্ণ ভিন্ন আবেগে আর ভিন্ন বোধে তাড়িত এই পর্বের প্লট ভাবনা। লেখকের বর্ণনায়: 'অতীত তিরিশটি দিনের সঙ্গে এখনকার দিনগুলির আর মিল নেই, আবার উত্তীর্ণ হয়ে এসেচি নূতন আলোয় ও নব অধ্যবসায়ে। জীবনের গতি এমনি। আবার সে পেয়েচে একটি নূতন বেগ। আজ ভাবচি চিত্তধর্মের কোনো নির্দিষ্ট নীতি নেই, চিত্তলোকের কামনার কোনো বাঁধা ধরা পদ্ধতি নেই, নিজের আনন্দের পথ সে নিজেই নির্বাচন করে নেয়, সংস্কারের বাধায় সে আপন উৎসকে রুদ্ধ করতে রাজি নয়'।[৩১] তেত্রিশতম দিনে এসে কাণ্ডিওয়ালা, তুলসী, কালীচরণ, তোতারাম ও প্রায় প্রথমাবধি তীর্থযাত্রী গোপালদার বিদায় শুধু চরিত্রের বিদায় নয় কাহিনীর পরিণতিরও আভাস এনে দেয়। টুকরো টুকরো সান্নিধ্যে কথকের হৃদয়ে রাণীর প্রতি জেগে ওঠে অলংকৃত আবেগ। কথকের ভাবনায়, 'চলেচি পাশাপশি। যেন স্বপ্নলোক থেকে দুটি পক্ষীরাজ আমাদের দু'জনকে নিয়ে নামচে নেমে আসচে শূন্যলোক পেরিয়ে।'[৩২] 'স্বর্গ' থেকে বিদায়, এবং মর্তভূমির বিচিত্র জটিলতায় পদার্পণ। প্রবোধকুমারকে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠিতে তারই ঘোষণা: 'এই বইয়ে তোমার দৃষ্টি, তোমার মন, তোমার ভাষা সমস্তই পথ চালিয়ে পাঠকের মনকে রাস্তায় বের করে আনে। তোমার লেখা চলেছে শাস্ত্রিক পথ দিয়ে নয়, ভৌগোলিক পথ দিয়ে নয়, মানুষের পথ দিয়ে।'[৩৩] 'পুণরাগমন' পর্বে কথক ও রাণীর জীবনানুভবের দীর্ঘ সংলাপ, সমাজধর্ম ও চিত্তধর্মের শৃঙ্খলিত, সঙ্কুচিত, বঞ্চিত বিষয়ের ভাষণ এবং আত্মবিকাশের অন্তরায় হেতু মানবের সমূহ পরাভবের যৌক্তিক উপস্থাপন লক্ষণীয়। তবে জীবনাদর্শের অতিকথন প্লটে এনে দিয়েছে শৈথিল্য। মনুষ্যত্ব আর মানবতার সকল আবরণ খসে পড়ে মানুষ কেন উন্মত্ত হয়ে ওঠে, 'হিংসা-হানাহানি, রক্তপাত আর সমাজবিপ্লবের সাথে কেন জড়িয়ে পড়ে ধর্ম-নীতিপরায়ণপন্থী মানুষ তার কারণ সন্ধানী কথকমন। কথকের জিজ্ঞাসাজর্জর হৃদয়: 'কেন শান্তিবাদ, প্রেম, দয়া, স্নেহ, স্বপ্ন,

সৌন্দর্যবোধ, দেবত্বচেতনা ইত্যাদি মহত্তর জীবনদর্শনের সমস্ত আদর্শবাদ চূর্ণ করে আত্মঘাতী মানুষ বারম্বার ছুটে যায় সর্বনাশা স্থূল বুদ্ধির পথে? কেনই বা আত্ম-সৃষ্ট হিংসা ঘৃণা বিদ্বেষ লোভ ক্রোধ মত্ততা-এদের অতিক্রম করে মানুষ আবার ফিরে আসে আনন্দের মধ্যে? মানুষ কি চিররহস্যময় নয়'?[৩৪] এই রহস্যময় আঁধারেই রচিত *মহাপ্রস্থানের পথের* প্রায় সব চরিত্র। একদা খুনী আসামী, ব্রহ্মচারী, অঘোরবাবুর পতিতা স্ত্রী, পরিব্রাজক কথকের দ্বান্দ্বিক মতবাদ, তীর্থের 'ভগবানকে' স্বীকার না করা বিধবা চরিত্র রাণীর উপাসনের অপূর্ব লাবণ্য ও দীপ্তিময় অনির্বচনীয় মাধুর্য রহস্যাবৃত্ত হয়েই থেকেছে শেষাবধি। ইহকাল, পরকাল, পূর্বজন্মের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী।

তারপরও ইতিবাচক জীবনে বিশ্বাসী লেখক প্রবোধকুমার সান্যাল প্রতিষ্ঠা করেছেন, জয়গান গেয়েছেন সত্য-সুন্দর মহৎ মানবতার। তাঁর মতে: 'পৃথিবীতে এতো নাস্তিকতা, সন্দেহবাদ ও সিনিসিজ্‌ম মনের এত মালিন্য ও চরিত্রের এত অধঃপতন, সাহিত্যের সুলভ রোমান্টিসিজ্‌ম ও সৌখিন কল্পনা, সত্য ও ন্যায়ের তথাকথিত আদর্শের প্রতি মানুষের এত অবিশ্বাস কিন্তু তৎসত্ত্বেও যা কিছু সদগুণ মানব চরিত্রকে উজ্জ্বল করে তার মূল্য আমরা না দিয়ে থাকতে পারি না'।[৩৫] কথকের কথানুযায়ী মানুষের গভীর আনন্দ আর বেদনার সংমিশ্রণের কাহিনী *মহাপ্রস্থানের পথে*। এই উপন্যাসের মত ও পথ স্পর্শ করেছে মানুষের মহাজীবনকে। প্রবোধকুমার সান্যালের ঔপন্যাসিক প্রবণতার মৌল দিকও তাই। সমাজ ও সমাজস্থিত মানুষকে পুরোপুরি তুলে ধরা। এই মানুষ হরেক রকম স্রোতের ভেতর থেকেই বেছে নেওয়া। জটিল-কুটিল, উচ্চ-নিম্নশ্রেণীর বর্ণ-বিত্তের অসংখ্য চরিত্রের সমারোহ তাঁর উপন্যাসে। এই উপন্যাসেও এর খুব বেশি ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু অসংখ্য চরিত্রের ভারে বিষয়ের বিশদ বিশ্লেষণ অসম্ভব হয়ে উঠেছে। ফলে ঘুরে ফিরে দেখা যায় যে কোন বিষয়ের সংক্ষিপ্ত অবতারণা এবং সংক্ষিপ্ত ফলাফল বিবৃত হয়েছে দুই একটি লাইনেই। ব্যক্তির সমস্যা-সংকটের ট্র্যাজিক সম্ভাবনা রোপিত হয়েও আলোর মুখ দেখেনি। শুধু পথের প্রত্যাবর্তনে কথক ও রাণীর দীর্ঘ সময়ক্ষেপণই এই উপন্যাসের একমাত্র জমাটবদ্ধ প্লট চিত্র, এবং তাদের মানবীয় বোধের অন্তর্চিত্রই এই উপন্যাসের সমস্যার শীর্ষবিন্দু।

প্রবোধকুমার সান্যালের মুখ্য উদ্দেশ্য সবার ওপরে 'মানব সত্যের' বাণী প্রতিষ্ঠা করা। তাই উপক্রমণিকায় 'প্রথম বৈশাখের জ্বলন্ত চিতায় শুরু হওয়া তীর্থযাত্রা' 'শেষ জ্যৈষ্ঠের আগুনে হা হা করে জ্বলার' মধ্য দিয়ে শেষ হলেও লেখকের শিল্পিত সবুজ ঝুঁকে পড়েছে মানবের মহাজীবনের দিকে। 'সুফল' পর্বেই পাওয়া যায় তার যথোপযুক্ত বর্ণনা। লেখকের চিরায়ত আত্মজিজ্ঞাসার শৈল্পিক ধারাভাষ্য:

> গল্প লিখি, উপন্যাস রচনা করি, কিন্তু তার ভিতরে অতি সঙ্গোপনে মানব-জীবনের এই প্রশ্ন থেকে যায় জীবন কি সাহিত্যের চেয়ে বড় নয়? মানব-যাত্রী কি একদিন স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনায় তীর্থযাত্রা করবে না? মহত্তর জীবন, নিষ্পাপ প্রেম, অকলঙ্ক মনুষ্যত্ব, আনন্দময় মানস-সত্তা এরা কি সেই অপরূপ তীর্থপথের পাথেয় হয়ে উঠবে না?[৩৬]

প্রবোধকুমার সান্যালের পূর্বাপর অনেক উপন্যাসে এই বিবাগী পথচলার নেশাগ্রস্ত চরিত্র কাহিনীর মধ্যবর্তী চরিত্র (Intermediate Character) হিসেবে অঙ্কিত। কিন্তু *মহাপ্রস্থানের পথে*-ই সর্বপ্রথম ব্যক্তি চিন্তা ও ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। কথকের পথ চলার নেশাই এই উপন্যাসের আপাদমস্তক রূপায়ণ। ফলে এ উপন্যাসের একটি বড় গর্ব এর চরিত্র নির্মাণ। *মহাপ্রস্থানের পথে*র বিভিন্ন চরিত্রের বাস্তবতা বিদ্যমান। ভবানী মুখোপাধ্যায়ের ভাষ্যমতে, "প্রবোধ ফিরে এল, সাহসনগরে গোপালদা, চারুর মা প্রভৃতি 'মহাপ্রস্থানের পথে'র চরিত্রগুলিকে একদিন চাক্ষুষ করে এলাম।"[৩৭] চরিত্রের প্রাচুর্য এবং ঘটনার বিস্তার কেমন করে একটি উপন্যাসে জায়গা করে নেয়, শিল্পের বৃত্ত গড়ে তোলে অবলীলায়— *মহাপ্রস্থানের পথে* তার একটি বড় সাক্ষ্য। কথক ও অন্যান্য তীর্থযাত্রীর জ্ঞানদৃষ্টির দুস্তর ব্যবধান এবং কথকের আত্মভাবনাকে কেন্দ্র করে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বা কখনো প্রকাশ্য মতভেদ বা তর্ক-বিতর্ক উপন্যাসের কাহিনীর অগ্রগতির সজীব শক্তি। লেখকের শ্রেণিভাবনা এখানে প্রখর, কিন্তু তাঁর সমাজভাবনা তারও অধিক জাগ্রত। এজন্যেই সমাজবাস্তবতা উপেক্ষিত থাকেনি এই উপন্যাসে; বরং ব্যক্তি অভিজ্ঞতার ভাল-মন্দ দিক ব্যবহারের পাশাপাশি সদা সচেষ্ট থেকেছেন সমাজরূপ অনুধাবন ও উপস্থাপনে। এই দ্বিবিধ পথ আঁকড়ে ধরেছেন একদিকে আত্মকথার যথার্থ স্ফূরণে, অন্যদিকে সমাজ ও মানুষের প্রতি অগাধ অনুরাগসর্বস্বতার কারণে। অস্তি-নেতির ক্ষেত্রে প্রবোধকুমার সান্যালের যে মানসিক দ্বন্দ্বময়তা সেই দ্বন্দ্বসংকুল চেতনার আলোকেই রাণী চরিত্রের অনুপ্রবেশ। নিজ মুখে যে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের তার্কিক ভাষা বর্ণিত হয়নি, রাণী সেই আইডিয়লজির বাহন হিসেবেই ব্যবহৃত। পাঠককে বিস্মিত হতে হয় এই ভেবে যে, রাণী বিধবাচর্যার সকল আয়োজন সুসম্পন্ন করে এসেছে দীর্ঘদিন, ধ্যানের মাতৃমূর্তি যার সত্তায় নিয়ত জাগরূক, সেই রাণীর সংলাপে যখন আরোপিত হয়েছে পরমাত্মার প্রতি বিশ্বাসহীনতার তীর্যক প্রশ্ন। এটা যে কাহিনীর প্রয়োজনে লেখকের আদর্শভাবনার অযাচিত আরোপ তা সহজেই অনুমেয়। তবে এটা ঠিক উপন্যাস যে শুধু আত্মকথার ফুলঝুরি নয়, জীবনের সামগ্রিক সীমার চিত্রায়ণ সেই সতর্ক চেতনা থেকেই রাণী চরিত্রের বৈচিত্র্যময়তা।

মহাপ্রস্থানের পথে রচনার পর অনেকেই প্রবোধকুমারকে চিঠি লেখেন বা অন্যান্য জায়গায় মতামত প্রকাশ করেন। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন অংশে প্রবোধকুমার উল্লেখ করেছেন— 'মুখোমুখি যাঁরা আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, রায়বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন সিংহ, রামেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।'[৩৮] আপাতদৃষ্টিতে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের বাইরের দৃশ্যাবলী বর্ণিত হয়েছে এ উপন্যাসে। কিন্তু পথের দুই ধারের প্রকৃতির যে উপাদান তা জীবনেরই প্রতিরূপ। ঠিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো। প্রবোধকুমার সান্যালের প্রকৃতি কথা বলে ওঠে, রঙে রূপে রসে আমাদের রাঙিয়ে তোলে। *মহাপ্রস্থানের পথে* উপন্যাস পড়তে পড়তে পাঠকও এক সময় হয়ে যায় তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। যাত্রাপথের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

আর যাত্রারত মানুষের অসংখ্য চারিত্র্য— দুয়ে মিলে গড়ে উঠেছে প্রত্যাশিত সামগ্রিক জীবন। মানুষ, প্রকৃতি আর কথকের অন্তরের সংযোগ সাধনে ঔপন্যাসিক সিদ্ধির স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রথমে পথে নেমে প্রকৃতির সৌন্দর্যলোকে অবগাহন, এরপর ধীরে ধীরে অসংখ্য চরিত্রের সঙ্গে কথোপকথন এবং তার মধ্যদিয়ে পরমস্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন। কাহিনীর সমাপ্তিতে এসে দুয়ের অনন্য সমন্বয়। মাধ্যম রাণী। কাহিনী গ্রন্থন রীতিটি লক্ষ্য করার মতো। মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, প্লট শিথিল, কাহিনী সংগতিহীন, ভাষা অতি মাত্রার কাব্যিক, এগুলোকে ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রবোধকুমার সান্যালের ব্যর্থতার স্মারক বলেও মনে হতে পারে। কিন্তু *মহাপ্রস্থানের পথে*-তে এটাই প্রবোধকুমার সান্যালের স্বতন্ত্র শিল্প কৌশল।

তথ্যসূচিঃ

১ প্রবোধকুমার সান্যাল, 'আমার জীবন আমার ভ্রমণ', *দেশ: সাহিত্য সংখ্যা*, (কলকাতা ১৩৯০ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৭১

২ প্রবোধকুমার সান্যাল, *মহাপ্রস্থানের পথে*, সপ্তদশ মু., (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ, ১৯৭২), পৃ. ২০৬

৩ প্রবোধকুমার সান্যাল, 'আমার জীবন আমার ভ্রমণ', *দেশ: সাহিত্য সংখ্যা*, (কলকাতা ১৩৯০ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৭২

৪ প্রবোধকুমার সান্যাল, *বনস্পতির বৈঠক*, (কলকাতা, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ) পৃ. ১৫৯

৫ প্রবোধকুমার সান্যাল, ' আমার জীবন আমার ভ্রমণ', *দেশ: সাহিত্য সংখ্যা*, (কলকাতা ১৩৯০ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৭২

৬ প্রবোধকুমার সান্যাল, *মহাপ্রস্থানের পথে*, ২য় সং., (কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৭২), নিবেদন অংশ

৭ প্রবোধকুমার সান্যাল, *মহাপ্রস্থানের পথে*, সপ্তদশ মু., (কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৭২), পৃ. ৫

৮ প্রবোধকুমার সান্যাল, *মহাপ্রস্থানের পথে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২

৯ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আমার দেখা প্রবোধকুমার', *কথাসাহিত্য*, (কলকাতা, শ্রাবণ, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ), পৃ ৮২৩

১০ প্রবোধকুমার সান্যাল, *মহাপ্রস্থানের পথে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

১১ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

১২ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬

১৩ পূর্বোক্ত

১৪ পূর্বোক্ত

১৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

১৬ শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, কলিকাতা: ৪র্থ সং. ১৩৬৯, পৃ. ৪৭৬

১৭ প্রবোধকুমার সান্যাল, *মহাপ্রস্থানের পথে*, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৯

১৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১

১৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯

২০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩

২১ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭

২২ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬
২৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০
২৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩
২৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫
২৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪
২৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭
২৮ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ,'মহাপ্রস্থানের পথে', *কথাসাহিত্য*, (কলকাতা, শ্রাবণ, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ), পৃ ৭৫৪
২৯ প্রবোধকুমার সান্যাল, *মহাপ্রস্থানের পথে*, *পূর্বোক্ত*,পৃ. ১০৬
৩০ পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১
৩১ পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪
৩২ পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১
৩৩ প্রবোধকুমার সান্যাল, *বনস্পতির বৈঠক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৭
৩৪ প্রবোধকুমার সান্যাল, *মহাপ্রস্থানের পথে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫
৩৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭
৩৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০
৩৭ ভবানী মুখোপাধ্যায়, 'প্রবোধকুমার', *কথাসাহিত্য*, (কলকাতা, শ্রাবণ, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৮০৯
৩৮ প্রবোধকুমার সান্যাল, *মহাপ্রস্থানের পথে*, ২য় সং., (কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৭২), নিবেদন অংশ